বিদ্যা — জগৎ সম্পর্কে

সত্য — বিশ্বের যে নৈতিক শক্তি বা ঋত তারই প্রকাশ হয় মা

মতই সত্য অপরিণামী।

বর্ণ ও আশ্রম নির্বিশেষে যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য

ধর্মগুলিকে সাধারণ ধর্ম বলে। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সমাজবদ্ধ

উপরেই এই কর্তব্যগুলি আরোপিত হয়। যদি কোন মানুষ সমাজে বসবাস

তাহলে তার ক্ষমাশীল হওয়ার বা অতিথিপরায়ণ হওয়ার কোন অর্থ হয় না

সাধারণ বলা হলেও কেবলমাত্র সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাছে এই

পালনীয়। আসলে মানবসমাজের অস্তিত্ব এবং ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

ধর্মগুলি প্রতিটি মানুষের মৌলিক কর্তব্য বলে স্বীকার করা হয়। বর্ণাশ্রম

মানুষের সামাজিক অবস্থান সাপেক্ষ (situational)। সুতরাং সাধারণ ও

ধর্মের প্রভেদকে মৌলিক ও অবস্থানগত ধর্ম বলা যেতে পারে।

বর্ণধর্ম

মানুষের বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানগত ধর্মের মধ্যে একটির নাম বর্ণ

'বর্ণ' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ রঙ (colour)। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিতে এই শব্দ

মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতাকে বোঝায়। মানুষের এই মানসিক প্রবণতা

একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতার উপর তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে

পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের মত মানুষও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমন্বয়ে সৃষ্ট

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এই তিনটি গুণ আছে। তবে কোন পদার্থের মধ্যেই এই

ত্রিগুণ সাম্যাবস্থায় থাকে না। যে কোন পদার্থে একটি গুণ প্রধান হয় এবং অপর

দুটি গুণ অপ্রধান হয়। মানুষের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য।

প্রতিটি গুণের স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। সত্ত্বগুণের স্বভাব জ্ঞানবত্তা। রজঃ গুণের স্বভাব চলমানতা বা চঞ্চলতা। তমঃ গুণ জড়স্বভাব।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ত্রিগুণ থাকলেও সকলের মধ্যে একই গুণ প্রধান নয়। কোন মানুষ সত্ত্বপ্রধান, কোন মানুষ রজঃ প্রধান এবং কোন মানুষ তমঃ প্রধান

হতে পারে। গুণের প্রাধান্যের এই ভেদের ভিত্তিতে বর্ণভেদ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র — এই চতুবর্ণ গুণের তারতম্যের ভিত্তিতে কল্পিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ সত্ত্বপ্রধান। পবিত্রতা, ক্ষমাশীলতা, দৃঢ়তা জ্ঞানবত্তা, প্রজ্ঞা, সংযম প্রভৃতি ব্রাহ্মণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে রজঃ গুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও তমঃ অপ্রধান। তাই ক্ষত্রিয়ের চরিত্রে শক্তিমত্তা, ধৈর্য্য, যুদ্ধে পলায়ন না করার প্রবণতা প্রভৃতি দেখা যায়। ক্ষত্রিয় শ্রেণী দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজকে সুরক্ষিত রাখে। বৈশ্যগণের মধ্যে রজঃ গুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও তমঃ গুণ অপ্রধান। বৈশ্যগণ কর্মী। তারা বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকে। সমাজের বৈষয়িক ব্যাপারে তারা দক্ষতার পরিচয় দেয়। শূদ্রের মধ্যে তমঃ গুণ প্রধান এবং সত্ত্ব ও রজঃ গুণ অপ্রধান দেখা যায়। তারা উদ্যমী নয়। কিন্তু তারা জীবনধারণের জন্য পরিশ্রম করে এবং অন্যশ্রেণীর মানুষদের সেবা করে।

এইভাবে গুণ অনুসারে সমাজভুক্ত মানুষের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলিকেই 'বর্ণ' বলে। প্রতিটি বর্ণের গুণের প্রাধান্য অনুসারে তাদের ধর্ম বা কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে। এই ধর্মগুলিকেই বর্ণধর্ম বলে।

বর্ণধর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির সামাজিক মূল্য অপরিসীম। সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন যদি বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে মানুষের চতুর্বিধ বর্ণের মত সমাজের প্রয়োজনও চতুর্বিধ। সমাজকে যদি সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হয় তাহলে তাকে সুরক্ষিত রাখতে হবে, তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটাতে হবে, তার সেবা করতে হবে এবং তাকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে। বিভিন্ন বর্ণের যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ করা হয়েছে সেই সমস্ত ধর্ম বা কর্তব্য সমাজের এই বিভিন্ন দাবীকে পূর্ণ করতে সক্ষম। শূদ্রগণ সমাজের সেবায় নিযুক্ত থাকবে, বৈশ্য তার অর্থনীতিকে পুষ্ট করবে, ক্ষত্রিয় তার শক্তি ও শৌর্যের সাহায্যে সমাজকে সুরক্ষিত রাখবে এবং ব্রাহ্মণ তার প্রজ্ঞার আলোকে সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে। ঋক্‌বেদের পুরুষ সূক্তে বলা হয়েছে যে সৃষ্টিকর্তার মুখমণ্ডল থেকে ব্রাহ্মণের উদ্ভব হয়েছিল; ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব হয়েছিল বাহুদ্বয় থেকে; বৈশ্যের উদ্ভব উরুদেশ থেকে এবং শূদ্রের উদ্ভব হয়েছিল পদদ্বয় থেকে। প্রতিটি অঙ্গের যেমন গুরুত্ব আছে সেইরকম প্রতিটি বর্ণেরও সামাজিক প্রয়োজন আছে।

স্বধর্মের ধারণা — 'স্বধর্ম' শব্দের অর্থ নিজের ধর্ম বা নিজের বর্ণগত ধর্ম। স্বধর্ম বাস্তবিক বর্ণাশ্রমের অতিরিক্ত কোন ধর্ম নয়। **একটি বর্ণের অন্তর্গত মানুষের সেই বর্ণগত যে ধর্ম তাই তার স্বধর্ম।** যেমন, ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত একজন মানুষের যুদ্ধ করা বা স্বদেশকে সুরক্ষিত রাখাই স্বধর্ম। বৈশ্য যেহেতু বণিক

শ্রেণীভুক্ত তাই ব্যবসা-বাণিজ্য করাই তার স্বধর্ম। এইভাবে প্রত্যেক মানুষ যে বর্ণের অন্তর্গত সেই বর্ণের ধর্ম বা কর্তব্যই তার স্বধর্ম।

অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করার জন্য গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে 'স্বধর্ম' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে অর্জুন যেহেতু ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত তাই যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়াই তাঁর স্বধর্ম। অর্জুন যদি যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকেন তাহলে তিনি স্বধর্মচ্যুত হবেন। স্বধর্ম পালন করতে প্রত্যেক মানুষই দায়বদ্ধ থাকে। অর্জুন ক্ষাত্রধর্ম পালনের দায়বদ্ধতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। এর থেকে বোঝা যায় যে স্বধর্মের ধারণা বর্ণধর্মের ধারণা থেকে ভিন্ন নয়।

স্বধর্ম পালন করাকে একজন ব্যক্তির কর্তব্য বলা হয়েছে কেন — একথা বিচার করা প্রয়োজন। উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়েছে যে বর্ণধর্মে বস্তুতঃ সমাজের বিভিন্ন মানুষের বৃত্তিগত কর্তব্যের কথাই বলা হয়েছে। একজন মানুষ একটি বিশেষ বৃত্তিতে দক্ষ বলেই তাকে একটি বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। একজন ক্ষত্রিয় ক্ষাত্রগুণ সম্পন্ন অর্থাৎ শৌর্যবীর্যের অধিকারী বলেই সে ক্ষত্রিয় বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং এই কারণেই যুদ্ধে নিযুক্ত হওয়া তার স্বধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন — স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়। একথার গভীর সামাজিক তাৎপর্য আছে। যে ক্ষত্রিয় বর্ণভুক্ত সে যদি ব্রাহ্মণের বা বৈশ্যের কর্মে নিজেকে নিযুক্ত করে তাহলে সমাজই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব নয়; শূদ্র বাণিজ্যে অপটু। তাই কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করলে কোন ব্যক্তিই সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে না। মানুষের কর্তব্য তার সামাজিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

স্বধর্ম মানুষের বৃত্তিগত দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতার মূল তার স্বভাবগত দক্ষতার মধ্যে নিহিত। মানুষ তার নিজস্ব বর্ণনিষ্ঠ কর্মে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে। সহজেই বোঝা যায় যে স্বধর্ম বাস্তবিক বর্ণাশ্রম ধর্মেরই নামান্তর।

আশ্রম ধর্ম

'আশ্রম' শব্দটি জীবনের এক একটি অধ্যায়কে বোঝায়। প্রাচীন ভারতে মানুষের সমস্ত জীবনকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছিল — ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। এই চারটি আশ্রম লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে মোক্ষ লাভ করাকেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সেইজন্য জীবনের নানা প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়নি। মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্তি লাভ করবে —একথা যেমন সত্য সেইরকম তার যে একটি জৈব সত্তা আছে সেকথাও একইভাবে সত্য। মানুষের জীবন এই জৈব সত্তা থেকে পারমার্থিক সত্তায় উত্তরণের ইতিহাস। চারটি আশ্রমধর্মের মধ্য দিয়ে মানুষের সেই উত্তরণ ঘটে।

আশ্রমধর্ম বলতে প্রতিটি আশ্রমের কর্তব্যকে বোঝায়। মানুষ জীবনের এক একটি পর্যায়ে এক একটি আশ্রমে অবস্থান করে। আশ্রমভেদে তার কর্তব্যও ভিন্ন হয়। একটি আশ্রম ধর্ম পালন করে মানুষ তার পরবর্তী আশ্রমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়। চারটি আশ্রম অতিক্রম করে মানুষ মোক্ষলাভ করে।

ব্রহ্মচর্য — ব্রহ্মচর্যই মানুষের সমগ্র জীবনের ভিত্তি রচনা করে। ব্রহ্মচর্যকে মানুষের শিক্ষালাভের অধ্যায় বলা হয়েছে। গুরুগৃহে বেদবিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে ব্রহ্মচারীর চরিত্র গঠিত হয়। আত্মসংযম ও ইন্দ্রিয় সংযমের মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্র গঠনই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। সাধারণভাবে প্রাক্‌বিবাহের সংযত জীবনকে যদিও ব্রহ্মচর্য বলা হয়; তাহলেও 'ব্রহ্মচারী' শব্দটির আর একটি প্রসিদ্ধ অর্থ আছে। "ব্রহ্মাণি চরতি ইতি ব্রহ্মচারী" — সেই ব্যক্তিকেই ব্রহ্মচারী বলা যায় যে জীবনের সমস্ত কর্মের মধ্যেও ব্রহ্মভাবনায় লীন থাকে। অবশ্য এর জন্য মানুষকে সংযতেন্দ্রিয় হতে হবে। সংযত জীবনে প্রাণশক্তির স্ফূরণ হয় যা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন পথে নিয়ে যেতে পারে।

গার্হস্থ — ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অবসানে মানুষ গৃহাশ্রমে প্রবেশ করে। গৃহাশ্রমে বিবাহিত জীবন বা সংসার জীবনকে গার্হস্থাশ্রম বলা হয়। এই আশ্রমে প্রবেশ করে মানুষ ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। বংশধারাকে অব্যাহত রেখে মানবজাতির প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখা গার্হস্থাশ্রমের কর্তব্য। সাংসারিক বা পারিবারিক জীবন মানুষের জৈব তৃষ্ণা নিবৃত্তির স্থান নয়। সংযত বিবাহিত জীবনযাপন করে মানুষ নিজেকে পরবর্তী আশ্রমের জন্য প্রস্তুত করে।

প্রতিটি আশ্রমেই যেহেতু মোক্ষ লাভের প্রস্তুতি চলে তাই ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি এখানে সংযত। এই আশ্রমে বংশবৃদ্ধি ছাড়াও মানুষকে আরও বহুবিধ কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন পিতামাতার সেবা, সন্তানের প্রতিপালন, অতিথিসেবা, দেবপূজা ইত্যাদি। মানুষ এই গার্হস্থ আশ্রমেই তার মৌলিক ঋণশোধ করার চেষ্টা করে — যেমন, দেবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ। প্রত্যেক মানুষই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। সূর্য, বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি ইত্যাদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতি নানা দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত। দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত যাগযজ্ঞের মাধ্যমে মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে। তাছাড়া উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়েও মানুষ দেবঋণ পরিশোধ করে।

সন্তান উৎপাদন করে বংশধারাকে অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মানুষ গার্হস্থ জীবনে পিতৃঋণ শোধ করে। বেদাধ্যয়ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ঋষিঋণ শোধ হয়। এইভাবে জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং সংস্কৃতি অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচে।

গার্হস্থ আশ্রমে মানুষকে নানাবিধ মহাযজ্ঞ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে —যেমন, ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। ভূতযজ্ঞের অর্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর সেবা করা এবং তাদের সংরক্ষণ করা। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করাই মনুষ্যযজ্ঞ। দেবতার দ্বারা অধিষ্ঠিত প্রকৃতির সেবাই দেবযজ্ঞ। পিতৃযজ্ঞের অর্থ পূর্বপুরুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন এবং তাঁদের স্মরণ, কারণ তাঁরাই আমাদের যাবতীয় মঙ্গলের জন্য দায়ী। পবিত্র গ্রন্থাদি পাঠের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মযজ্ঞ করা হয়। গার্হস্থ আশ্রমে এই সমস্ত যজ্ঞ পালনই কর্তব্য।

বানপ্রস্থ — গার্হস্থ জীবন সার্থকভাবে সমাপ্ত হলে মানুষ তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থে প্রবেশ করে। বাণপ্রস্থে মানুষ যেন স্বেচ্ছানির্বাসনে যায়। গার্হস্থ আশ্রমে জীবনের ভোগ ও নানা কর্তব্য সমাপ্ত হলে মোক্ষলাভের প্রয়োজনে মানুষ কৃচ্ছ্র সাধনে ব্রতী হয়। কৃচ্ছতায় মানুষের চিত্তশুদ্ধি হয়, নিরাসক্তি আসে এবং সে তখন ত্যাগের সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য চিত্ত শুদ্ধি। চিত্ত শুদ্ধ হলে মানুষ সাধনমার্গের উচ্চতম স্তর সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হয়।

সন্ন্যাস — সন্ন্যাসের মধ্য দিয়ে বানপ্রস্থ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী কোন নির্দিষ্ট স্থানে বা গৃহে অবস্থান করেন না। বিচরণ-ই যেহেতু সন্ন্যাস আশ্রমের রীতি তাই সন্ন্যাসকে প্রবজ্যা বলা হয়। যিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করেন তিনি গৃহহীন বা অনিকেত। উপনিষদে সন্ন্যাসের লক্ষণ বলা হয়েছে যে, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করেন, যিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের মাধ্যমে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করেন তিনিই সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর জীবন নিরাসক্তির সাধনায় নিমগ্ন থাকে।

একটি সমস্যা — সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্মকে কেন্দ্র করে একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও সাধারণ ধর্ম ও বর্ণাশ্রম ধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মানুষের পক্ষে কোন্ ধর্মটি পালনীয় তার নির্দেশ পাওয়া কঠিন। যেমন, কৈকেয়ী রামকে বনবাসে প্রেরণ করার এবং ভরতের সিংহাসন প্রাপ্তির ব্যবস্থা করলে লক্ষ্মণ সক্রোধে বলেন যে রামের সিংহাসন যদি অন্য কেউ অধিকার করে তাহলে তিনি তাকে হত্যা করবেন। রাম তখন তাঁকে বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করতে নিষেধ করেন অর্থাৎ তিনি অগ্রজের সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করার জন্য ক্ষত্রিয়ের মত শৌর্য প্রদর্শনে উদ্যত হলে রাম তাঁকে সাধারণ ধর্ম পালন করতে নির্দেশ দেন। সাধারণ ধর্ম এই যে পিতৃসত্য পালন করাই পুত্রের ধর্ম। এইভাবে এখানে রাম বর্ণাশ্রমধর্মের তুলনায় সাধারণ ধর্মকেই বলবান বলে উল্লেখ করেন।